বিকল্পহীন অস্থির এই সময় ও
আনিসুর রহমানের
‘উন্নয়ন জিজ্ঞাসা’

- আতিউর রহমান*

”বিকল্পহীন অস্থির সময়ে নিঃসন্দেহে আনিসুর রহমানের দেয়া এইসব বিকল্প পথ আমাদের আশান্বিত করে। সুবাতাস বয়ে আনে। আশান্বিত করে এই জন্যে যে, এসব পথই আমাদের নিজস্ব, স্বজাতীয়।”

গত কয়েক বছরে সারা বিশ্বেই অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটে গেছে। এসব পরিবর্তন শুধু রাজনীতি বা অর্থনীতির অঙ্গনেই ঘটেনি। সমাজ-সংস্কৃতি সর্বত্রই পরিবর্তনের পরশ লেগেছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইতিবাচক ফলাফল সত্ত্বেও এসব পরিবর্তনের নীট ফসল হিসেবে যা চোখে পড়ছে তা কিন্তু এক বিশাল শূন্যতা। নতুন ঘর বাধার কোন বাস্তব সম্ভাবনা না থাকলেও বিশ্বব্যাপী পুরোনো ঘর ভাঙ্গার তোড়জোর চলছে। ফলে মানুষ উন্মুক্ত আকাশের নিচে উন্মুক্ত উন্মুল উদ্বাস্তুর ভরসাহীন পরিচয়হীন এক দঙ্গলে পরিণত হচ্ছে। বিকল্পহীন এক অস্থির সময় মানুষের দীর্ঘদিনের অর্জন, আশাবাদকে কুরে কুরে খাচ্ছে। ভাবনাচিন্তার জগতে বিকল্পহীনতার কয়েকটি দিক চোখে পড়ে:

এক, সারাবিশ্বেই আজ বৈশ্বিক পুঁজিবাদী ধ্যান–ধারণা ও পদ্ধতি বলতে গেলে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। সমাজতান্ত্রিক বিকল্প চিন্তা ও বাস্তবতা মুখ থুবড়ে তো পড়েছেই। পাশাপাশি ‘তৃতীয় বিশ্বে’র ‘তৃতীয় পথের’ যে ক্ষীণ আশাবাদ তৈরি হয়েছিল তাও এক ঝাপটা নিঃশেষিত–প্রায়। কেউ পছন্দ করুক বা না করুক আজ পুরো বিশ্বই একরৈখিক এক বাস্তবতার মুখোমুখি। রাষ্ট্রীয় বা শ্রেণীভিত্তিক যে দ্বান্দ্বিক ভারসাম্য বিরাজ করছিল তা যেন আজ হঠাৎ করেই বলগাহীন। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী এই একপক্ষীয় ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়ার সাথে হঠাৎ করে খাপ খাওয়াতে গিয়ে মানুষ খানিকটা হতভম্ব হয়ে পড়েছে। অনেকেই উদ্‌ভ্রান্তও বটে।

দুই, উপরের বাস্তবতার সাথে সম্পর্কিত হলেও যে বিষয়টি আরো জোরালো গুরুত্ব দাবি করে তা হচ্ছে বিশ্বব্যাপী বাজারী শক্তির উগ্র দাপট। রাষ্ট্রের চরিত্রে নির্যাতনীমাত্রা যুক্ত থাকলেও সমাজে শ্রেণীগত ভারসাম্য রক্ষার কারণে হলেও কিছু কিছু জনকল্যাণমূলক ‘জনতোষণ’ মূলক কাজ রাষ্ট্রকে এদ্দিন করে আসতে দেখা গেছে। কিন্তু বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংযোগের এই যুগে বাজার রাষ্ট্রকে একেবারেই পরাভূত করে ফেলেছে। বাজারে ‘অদৃশ্য হাতের’ ওপর ভরসা হঠাৎ করেই বেড়ে গেছে। সমাজতান্ত্রিক বা মিশ্র অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের ভূমিকা যেমনটি হয়ে উঠছিল তার সংশোধন হয়তো বা অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। কিন্তু বর্তমানে বাজারী শক্তির প্রসারের নামে মৌলবাদী কায়দায় অর্থনৈতিক নীতিমালা প্রবর্তনের যে প্রয়াস চলছে তা সত্যি উদ্বেগজনক। তৃতীয় বিশ্ব এই বাজারী জোয়ারে সত্যি

খাবি খাচ্ছে। এখানে সিভিল সমাজের অন্তর্নিহিত শক্তি কিছুটা হলেও জীবিত ছিল। গ্রামে মেলা, কুটির শিল্পের বৈচিত্র, দেশীয় কারিগরদের উদ্ভাবনী শক্তি, সংস্কৃতিতে আত্মপরিচয়ের চেষ্টা - এ সবই আজ বিশ্ববাজারের জোয়ারে ভেসে যাচ্ছে। পুরো তৃতীয় বিশ্বের অর্থনীতি আজ 'বিশ্ব সুপার মার্কেটের' অংশ হতে যাচ্ছে। এসব দেশের সাধারণ মানুষের চাহিদা-কাঠামো বদলে যাচ্ছে গণমাধ্যমে ও বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলোর কল্যাণে। ফলে দেশীয় উৎপাদকরা তাদের ঐতিহ্যবাহী পেশা থেকে সরে দাঁড়াচ্ছে। ফলে শ্রম বাজারেও লক্ষ্য করা যাচ্ছে যুগান্তকারী পরিবর্তন। বিশ্বব্যাপী এই একরৈখিক উৎপাদন প্রক্রিয়া শুধুমাত্র তৃতীয় বিশ্বের উৎপাদকদেরই বিপাকে ফেলেছে তা নয়, বিশ্ব নিজেও বঞ্চিত হতে যাচ্ছে নানা বৈচিত্র্যের পণ্য স্বাদ থেকে। সাংস্কৃতিক লেনদেন থেকে।

অর্থনৈতিক বৈশ্বিকরণের পাশাপাশি চলছে সাংস্কৃতিক অঙ্গণে আগ্রাসন। বিশ্বব্যাপী প্রতিবাদী সংস্কৃতির ধার কমে আসছে। তারুণ্য আজ বেকারত্ব ও আদর্শিক পঙ্গুত্বের কারণে দিশেহারা। চ্যালেঞ্জবিহীন এই সময়ে তারুণ্য নতুন কিছু সৃষ্টির জন্যে বিদ্রোহ করতে ভুলে গেছে। আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের দাস যারা হতে না পারছে, বিশ্ব অর্থনীতির ইঞ্জিন যাদের হাতে সেই অস্ত্রবাজ ও অতিলোভীদের ষড়যন্ত্রে তারা আজ সন্ত্রাসী। চোরাকারবারী বা মাদকাচ্ছন্ন বেপথো হয়ে পড়ে রয়েছে। তারুণ্যের এমন অপচয় মানব সমাজের অন্য কোন সময়ে এমনটি আর চোখে পড়ে না।

এসব কিছুই নিয়ন্ত্রণ করছে বিশ্ববাজার নিয়ন্ত্রণকারী প্রযুক্তিবাদী অভিজনেরা। যাদের লক্ষ্য হলো সহজেই বিশ্ববাজার দখল ও ঐতিহ্যবাহী লোকায়ত সৃজনী শক্তির বিনাশ। সংযোজনবাদী একরৈখিক এ প্রবণতার আদর্শিক জোর যোগাচ্ছে আন্তর্জাতিক অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানসমূহ। আর এসব কিছুই তারা করছে 'উন্নয়নের' নামে 'বিদেশী সাহায্যের' নামে, 'দারিদ্র বিমোচনের' নামে। তার মানে এই নয় যে, আমরা বিদেশী সাহায্য নেবো না, উন্নয়নে আগ্রহী হবে না। নিঃসন্দেহে আমরা উন্নয়ন চাই। তবে তা হতে হবে আমাদেরই শর্তে। আমাদের প্রয়োজনের আদলে। আমাদের আত্মশক্তির বিকাশের প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে। আমাদের লোকায়ত সৃজনী ক্ষমতার পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের লক্ষ্যে। আমাদের তারুণ্যের সম্মিলিত কর্মযজ্ঞে অংশগ্রহণের পূর্বশর্তে। জাতি হিসেবে গঠিত আত্মসম্মানের ক্ষেত্রে আরো প্রসারিত করার আকাঙক্ষার আলোকে। ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের পারস্পরিক বিকাশ ও স্বাধীন অস্তিত্বের পরিবেশ অক্ষুণ্ন রাখার লক্ষ্যে।

বিকল্পহীন এক হতাশাময় সময়ে যখন আমরা পথের খোঁজে হাতরাচ্ছি, ঠিক সেই সময়েই এক ঝলক আলোকবর্তিকা হাতে নিয়ে আমাদের মাঝে হাজির হয়েছেন অধ্যাপক আনিসুর রহমান তার 'উন্নয়ন জিজ্ঞাসা' নামের ছোট অথচ শক্তিমান এক বইয়ের মাধ্যমে। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এক বিরল অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠা কৃতী অর্থনীতিবিদ আনিসুর রহমান কিছুদিন বাংলাদেশের প্রথম পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যও হয়েছিলেন। চমৎকার সব ভাবনা থাকা সত্ত্বেও মুক্তিযুদ্ধের মতো এমন আগুনে পোড়া অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও উপযুক্ত সাংগঠনিক কাঠামো ও অঙ্গীকারের অভাবে কি করে একটি সম্ভাবনাময় জাতির অকালমৃত্যু ঘঠে আনিসুর রহমান তা খুব কাছে থেকে দেখেছেন।

সেজন্যে পুরোনো খোলনলচেসমেত স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্র কাঠামোর অমানবিক পিঞ্জর থেকে তিনি একদিন স্বজ্ঞানে বের হয়ে আসেন। বের হয়েই তিনি ছুটে যান গ্রামবাংলার সাধারন মানুষের বঞ্চনা ও তাদের সম্মিলিতভাবে বাঁচার প্রচেষ্টাসমূহ স্বচোখে দেখতে। মানুষের কাছাকাছি গিয়ে তাদের চোখ দিয়ে তাদের সমস্যা ও সম্ভাবনা দেখার এই যে পদ্ধতি তিনি আবিস্কার করলেন তা থেকে আজো বিচ্যুত হননি। তার সেই 'নতুন চোখ' তিনি বিদেশের মানুষের কাছেও পরিচিত করার চেষ্টা করেছেন। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার 'অংশিদারিত্বের গবেষনা' প্রকল্পগুলোতে কাজ করার সময় তিনি তার সেই চোখ দিয়ে সার্বজনীন এক পথের সন্ধান করেছেন। আমাদের পরম সৌভাগ্যে তিনি তার বহুদিনের আত্মজিজ্ঞাসা, আত্ম উপলব্ধি, সাধারণ মানুষদের চোখ দিয়ে সাধারণের সমস্যা দেখার কৌশলসমূহ সযত্নে লিপিবদ্ধ করেছেন 'উন্নয়ন জিজ্ঞাসা' নামের এই বইতে। দুটো অধ্যায়ে মোট ন'টি প্রবন্ধে তিনি তার 'উন্নয়ন জিজ্ঞাসা'কে বিন্যস্ত করেছেন।

প্রথম অধ্যায়ের নাম 'কেন হল না'। মূলত মুক্তিযুদ্ধের মৌল চেতনার কেন বাস্তবায়ন হলো না সে প্রশ্নের মুখোমুখি হতে চেষ্টা করেছেন লেখক এই অধ্যায়ে। একাত্তরে যে মুক্তির একটি পথ উঁকি দিয়েছিল সে কথা তিনি বইয়ের শুরুতেই উল্লেখ করেছেন। সে পথের খোঁজ করছি। কিন্তু সে অনুসন্ধান আমারা ভালোভাবে কখনও করিনি। আমরা এখনও দারুনভাবে সে পথের খোঁজ করছি। কিন্তু সে অনুসন্ধান সব সময় আমরা একাত্তরে সেই শ্রেষ্ঠ সময়ের কষ্টিপাথরে যাচাই করে করতে পারছি না বা চাইছি না। গোড়ায় এ গলদ ধরিয়ে দিয়ে আনিসুর রহমান লিখেছেন :

"পথ হয়তো একটা উকি দিয়েছিল একাত্তরের ডিসেম্বরে। বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মরহুম তাজউদ্দিন আহমদই বোধ হয় ঘোষণা করেছিলেন, যেসব দেশের সরকার মুক্তিসংগ্রামের বিরোধিতা করেছে তাদের কাছ থেকে কোনো সাহায্য নেয়া হবে না। তাতে যত কষ্টই আমাদের হোক। এই নীতি মেনে চললে কোমর বেঁধে সমাজকে নতুন ছাঁচে ঢালতেই হত।" (পৃঃ৩)

সে সমাজকে কেন নতুন ছাঁচে ঢালা যায়নি তার কিছুটা ব্যাখ্যাও সাহসের সঙ্গে দেবার চেষ্টা করেছেন। 'যে পথটা উকি দিয়েছিল সেটা মিলেয়ে গেল' কেন তার উত্তরও খোঁজার চেষ্টা করেছেন আনিসুর রহমান তার বইতে। আনিসুর রহমানের ধারণা মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের প্রশাসন ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব মুক্তিযুদ্ধের স্পিরিটটিই ভালোভাবে ধরতে পারেননি।

দেশের সংগ্রামী মানুষের সঙ্গে গ্রাম থেকে গ্রামে, জঙ্গলে কঠোর কষ্টের মধ্যে অদম্য প্রেরণা নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করার অভিজ্ঞতা, বড় ছোট ভেদাভেদ নেই - অন্ন, বস্ত্র, মাথা গোঁজার স্থান সবই স্বল্প বলে যা পাওয়া যাচ্ছিল তাই সবাই ভাগ করে নেবার মতো কালজয়ী অভিজ্ঞতা, নিজে না খেয়ে অন্যকে দেবার কথা বলার যে শিহরণ - সেসব কিন্তু রাজনৈতিক ও অন্যান্য এলিটদের সকলের মধ্যে ছিল না। যাদের সে অভিজ্ঞতা অর্জন করার সৌভাগ্য হয়েছিল তারা কিন্তু সে অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানোর মতো নেতৃত্ব ও রূপায়ণের পুরো সুযোগ পাননি। উল্টো, যাদের মোটেই এ অভিজ্ঞতা ছিল

না তাদের হাতেই রাষ্ট্র পরিচালনার ভার পড়লো। সুদক্ষ আমলাতন্ত্র রাজনৈতিক সুবিধাবাদ এবং হতাশ তারুণ্যের বিক্ষিপ্ত আচরণ একাত্তরের সে পথকে খুব দ্রুতই হারিয়ে ফেলতে সাহায্য করলো। বাঙালির গর্ব করার মতো একাত্তরের নয়টি মাসকে স্বীকার করা হবে কি হবে না সে নিয়ে সর্বত্রই যে টানাহ্যাঁচড়া চলতে থাকে তারই পরিণতিতে সে পথ মিলিয়ে যায় শূন্যে।

রাজনৈতিক নেতৃত্বের বলিষ্ঠ ভূমিকার অভাবে, দ্বন্দ্বসংকুল বাস্তবতার কারণে, পুরনো মূল্যবোধ আর মুক্তিযুদ্ধের চেতনার টানাটানিতে বাংলাদেশের হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হতে থাকে। সেই রক্তক্ষরণ আজো শেষ হয়নি। মুক্তিযুদ্ধোত্তর সমাজকে নতুন ছাঁচে গড়ার জন্যে ছাত্র, আমলা, সৈনিক, দলীয় রাজনৈতিক কর্মী, মুক্তিযোদ্ধারা নান প্রস্তাব নিয়ে এগিয়ে আসতে থাকেন। কিন্তু সম্মিলিত এ কর্মপ্রচেষ্টার কোন সফল রূপায়ণ সেদিন মূল্যবোধের দ্বন্দ্বের কারণে হতে পারেনি বলে আনিসুর রহমান দুঃখ করেছেন।

জনগণের ভোগে আশা আরো বাড়িয়ে দিয়ে সকলের জন্যে কৃচ্ছতা সাধনের একটি কর্মসূচী প্রণয়ন ও তা ভেস্তে যাবার গ্লানিকর অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা শেষে আনিসুর রহমান লিখেছেন, “দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যুদ্ধবিধ্বস্ত ইংল্যান্ডে সমাজতন্ত্রের স্তম্ভ ছাড়াই রানীকেও সপ্তাহে একটি মাত্র ডিম খেতে দেয়া হত। আমাদের নেতৃবৃন্দ এটুকুও পারলেন না কেন তার বিশ্লেষণ আমার যোগ্যতার বাইরে।”

আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস এ বিশ্লেষণী ক্ষমতা তার রয়েছে। তিনি যদি আরেকটু সাহস করে এ কাজটি করে ফেলেন, বিশেষ করে কেন তাজউদ্দিনের মতো নিবেদিতপ্রাণ নেতৃবৃন্দ থাকা সত্ত্বেও আমরা যুদ্ধজয়ের পরের পর্বটিতে এমন করে হেরে গেলাম, এমন অপ্রস্তুতভাবে আত্মসমর্পণ করলাম তার একটা নির্মোহ বিশ্লেষন খুবই জরুরী হয়ে পড়েছে।

রাজনৈতিক যুক্তিতর্কে না গিয়েও অবশ্যি আনিসুর রহমান আমাদের আর্থ–সামাজিক কাঠামোর কিছু গোড়ার গলদ চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছেন তার এই বইতে।

‘শিক্ষিত কে’ প্রবন্ধে আনিসুর রহমান মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের আনাচে কানাচে স্বউদ্যোগে তরুণরা যেসব স্বাবলম্বী উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর সূচনা করেছিল এবং সেগুলোর প্রতি প্রথাসিদ্ধ শিক্ষিত আমলা ও রাজনীতিকদের মনোভাবের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা সত্যি হৃদয় স্পর্শ করে। প্রাথমিক শিক্ষার মতো বিষয় যে আমলাদের হাতে ছেড়ে দেয়া যায় না সে কথাটি তিনি ঠাকুরগাঁর এক অখ্যাত গ্রামের অভিনব শিক্ষা আন্দোলনের উদাহরণ দিয়ে স্পষ্ট করে তুলেছেন। ‘পরিকল্পনাবিদ ও সমাজ’ নিবন্ধে তিনি বুদ্ধিজীবীদের শিক্ষা ও সমাজের প্রয়োজনীয়তার সাথে তার অসঙ্গতির কথা সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। পরিকল্পনাবিদদের লক্ষ্য করে তিনি লিখেছেন পারলে ‘গ্রামে গ্রামবাসীদের মতো থাকুন, তাদের সঙ্গে দিনে কয়েক ঘন্টা করে মাঠে কাজ করুন, কাজ করতে করতে তাদের সঙ্গে কথা বলুন---’। একইভাবে শ্রমিকদের কারখানায় গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করা যায়। এভাবে তথ্য সংগ্রহের পর পরিকল্পনা করলে নিশ্চিতভাবে শিক্ষিতজনের মেধার সর্বোচ্চ ব্যবহার করা সম্ভব হবে। এর পরের নিবন্ধে লেখক

চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষের পেছনে যে কাঠামোগত গলদ ছিল তা বিশ্লেষন করার চেষ্টা করেছেন। লঙ্গরখানার অমানবিক দিকগুলো চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে লেখক বেশ কিছু ব্যতিক্রমী অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন যা থেকে বোঝা যায় উপযুক্ত সাংগঠনিক উদ্যোগ নিলে কি করে এই জাতিকে লঙ্গরখানার ত্রানমনোভাবাপন্ন নেতিবাচক প্রবণতাসমূহ এড়িয়ে খুব সহজেই একটি আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন জাতি হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব হত। কিন্তু দুর্ভাগ্য, এ জাতির কৃষক ও সাধারণ মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টার বদলে এ দেশের প্রতিটি সরকারই ভিক্ষে করে খাদ্য যোগাড়ের একটি ভ্রান্ত নীতি গ্রহণ করতে মোটেও দ্বিধা করেননি। যার পরিণতিতে সমূহ সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও এ জাতি আজ পরনির্ভর, ভিক্ষুকের পরিচয়ে বেঁচে থাকার ভান করছে।

প্রথম অধ্যায়ের সর্বশেষ প্রবন্ধ 'আত্মনির্ভরশীলতার প্রশ্ন'-এ লেখক বিদেশী সাহায্যনির্ভরতার অপুরণীয় সামাজিক মূল্যের কথা বলেছেন। আত্মনির্ভর বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্নকে দুমড়ে মুচড়ে ফেলার যে কাজটি কোন প্রশ্ন না করে বিদেশি সাহায্য নেবার মাধ্যমে নেতৃত্ব দেশ স্বাধীন হবার পর থেকেই করে এসেছেন, তার মূল্য জাতিকে আজো দিতে হচ্ছে। গ্লানিকর এ উন্নয়ন অভিজ্ঞতার বর্ণনা করেই লেখক ক্ষান্ত হননি, আত্মনির্ভরশীলতার দর্শন ও পথের সন্ধানও দেবার চেষ্টা করেছেন বিভিন্নভাবে। সে পথটি কি? আনিসুর রহমানের ভাষায় "দেশের বিপুল শ্রমশক্তির সঙ্গে দেশের অন্যান্য সম্পদের সৃষ্টিশীল মিলনই এ পথ। এই মিলনের প্রেরণা ব্যক্তিস্বার্থ সিদ্ধির জন্য অবাধ প্রতিযোগিতা নয়। এরূপ প্রতিযোগিতা মানুষকে ছলে বলে কৌশলে সমাজের সম্পদ আত্মসাৎ করে নিজেকে সর্বাগ্রে এগিয়ে নিতে আহবান করে" ---(পৃঃ৫৫)। সেজন্য তিনি বলেছেন এমন দেশে প্রতিযোগীতা নয়, সহযোগিতা, সম্পদের ওপর যৌথ কর্তৃত্বের মাধ্যমে সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব। তার সাথে সাথেই আবার তিনি বিভিন্ন দেশে 'আমলাতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক' ব্যবস্থায় যে তা সম্ভব নয় তাও বলেছেন।

পরবর্তী অধ্যায়ের প্রবন্ধসমূহে তিনি এই বিকল্প উন্নয়ন নীতি দর্শন আরো বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। গণ-গবেষণার মাধ্যমে সমাজকে চেনা ও পরিবর্তনে অংশগ্রহণ করা, লোকচেতনার জাগরণ, 'জনগণের আত্ম-উন্নয়ণ', 'মানবিক মর্যাদার অগ্রাধিকার', 'গণদারিদ্র্যের সমস্যা,' 'ভোগমুখী দর্শন বনাম সৃষ্টিমুখী দর্শন', 'সমাজতন্ত্র নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট', 'সমাজ কাঠামোর পরিবর্তন', 'জ্ঞান সম্পর্ক পরিবর্তন', 'নতুন ধরনের নির্ভরশীলতা সৃষ্টির সম্ভাবনা' সেই সম্ভাবনায় বাইরের এনিমেটরদের ভূমিকা ইত্যাদি প্রসঙ্গ আলোচনার পর সর্বশেষ নিবন্ধে বিকল্প উন্নয়ন-প্যারাডাইমের দিক নির্দেশ করার উদ্যোগ নিয়েছেন। এই প্রবন্ধে প্রথমেই তিনি প্রশ্ন তুলেছেন 'আমরা কি উন্নয়ন চাই?' এরপর তিনি প্রচলিত উন্নয়ন ভাবনার পর্যালোচনাসাপেক্ষে নতুন প্যারাডাইমের কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। এসব বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছেঃ

১। উন্নয়ন হতে হবে আত্মপরিচালিত এক প্রক্রিয়া;

২। সেই প্রক্রিয়ায় মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক হবে স্তরমুক্ত;

৩। এই উন্নয়ন প্রচেষ্টার মূল লক্ষ্য হবে জ্ঞানসৃষ্টি ও নতুন জ্ঞান-সম্পর্ক স্থাপন করা;

৪। এ প্রক্রিয়ায় আমরা পরস্পরকে গড়ে তুলবো ও শাণিত করবো;

৫। এ উন্নয়নে অর্থনৈতিক অগ্রগতি নিঃসন্দেহে কাম্য, তবে তা হতে হবে মানুষের স্বজাতীয় সংস্কৃতিগত আচার-ব্যবহারের পরিপূরক।

৬. এই প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রের সনাতনী ভূমিকার মূল্যায়ন করা বাঞ্ছনীয়। জনগণের ওপর প্রভুত্ব নয়, তাদের গণউদ্যোগের সহায়তা ও সমন্বয় করার জন্য রাষ্ট্রের ভূমিকার পুনর্বিচারের প্রয়োজন রয়েছে।

বিকল্পহীন এক অস্থির সময়ে নিঃসন্দেহে আনিসুর রহমানের দেয়া এইসব পথ-বিকল্প আমাদের আশান্বিত করে। সুবাতাস বয়ে আনে। আশান্বিত করে এই জন্যে যে, এসব পথই আমাদের নিজস্ব, স্বজাতীয়। দীর্ঘদিন আমরা ‘আধুনিকায়ণের’ খপ্পরে পড়ে আরোপিত এক উন্নয়ন ভাবনার মোহে ছিলাম আচ্ছন্ন। আজো বৈশ্বিকরণের লক্ষ্যে একচোখা কাঠামোগত সংস্কার নীতির সীমাহীন সামাজিক মূল্য দিয়ে যাচ্ছি আমরা।

অধ্যাপক আনিসুর রহমানের সুলিখিত ‘উন্নয়ন জিজ্ঞাসা’র সমালোচনা করার মতো সাহস আমার নেই। তবু বিনীতভাবে কয়েকটি প্রসঙ্গ টানতে ইচ্ছে করছে।

প্রথমতঃ আনিসুর রহমান একাধিকবার বলতে চেষ্টা করেছেন বাঙালির বাঁচার একটি পথ একাত্তরে উঁকি মেরেছিল। যদিও আকারে ইঙ্গিতে তিনি সেই পথের রূপরেখাও আঁকবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বিস্তারিত বিশ্লেষণে যাননি। নিঃসন্দেহে মুক্তিযুদ্ধের একিট সদুঢ় আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত ছিল। বিশেষ করে একাত্তরে বাঙালি তার সকল পিছুটান উপেক্ষা করে এক হবার গৌরব অর্জন করেছিল। ঐ সময় বাংলাদেশের কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত – সকলেই কিছু মৌল আর্থ-সামাজিক আকাঙ্ক্ষার আদলে নিজেদের ভবিষ্যৎ কিভাবে নির্মাণ করা যাবে তার কিছু স্বচ্ছ স্বপ্ন দেখেছেন। স্থায়ী নিরাপদ স্বাবলম্বী এক কল্যাণী সমাজ ভাবনা সে স্বপ্নের আদল তৈরি করেছিল। সেই স্বপ্নকে খানিকটা হলেও সংবিধান ও প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ধরার একটা ক্ষীণ প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য মূল্যবোধের বিরোধ কিংবা নেতৃত্বের গুণাবলীর অভাবের কারণেই হোক সে ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাও শেষঅব্দি ভেস্তে যায়। আজ দেশব্যাপী মুক্তিযুদ্ধের চেতনা পুনরুদ্ধোরের কিছু প্রচেষ্টা চলছে। আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে সে চেতনার একটি গভীর বিশ্লেষণের প্রয়োজন কেউই অস্বীকার করবেন না। আর আনিসুর রহমানের মত সুপন্ডিতেরাই পারেন সে চেতনাকে হৃদয় দিয়ে অনুভব করে লেখনীর মাধ্যমে তুলে আনতে। আশাকরি বইটির পরবর্তী সংস্করণে আমাদের এ প্রত্যাশা তিনি পূরণ করবেন।

দ্বিতীয়ঃ, প্রচলিত উন্নয়ন প্যারাডাইমের দুর্বল দিকগুলো তিনি আরো জোরালোভাবে আনতে পারতেন। বিশেষ করে আধুনিকতাকায়ন তত্ত্বের ধারাবাহিকতার আলোকে তিনি প্রশ্ন তুলতে পারতেন কিভাবে বৈশ্বিক পুঁজিনির্ভর এই উন্নয়ন উন্মাদনা আমাদের মতো দেশের স্বজাতীয় সমাজ, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির আত্মশক্তিকে আঘাত করছে ও 'ভার্নাকুলার স্পেসকে' সংকীর্ণ করে ফেলছে। Wolfgang Sachs সম্পাদিত The Development Dictionary : A Guide to knowledge as power (Zed Books, ১৯৯২) বইতে উন্নয়ন প্যারাডাইমের বিষয়ে যেসব প্রশ্নের অবতারণা করা হয়েছে, বিশেষ করে সংস্কৃতি, প্রযুক্তি ও পরিবেশ ভাবনার আলোকে প্রচলিত উন্নয়নের সংকটকে যেভাবে লেখকরা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন সেসব প্রসঙ্গ নিয়ে তিনি আরো খানিকটা আলাপ করতে পারতেন। অবশ্য আনিসুর রহমান সম্প্রতি কয়েকটি আলোচনায় (বিশেষ করে অর্থনীতি সমিতি আয়োজিত বাজেট-উত্তর সেমিনারে দেয়া সভাপতির ভাষণ উল্লেখ্য) আমাদের প্রবৃদ্ধির সংকট, সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সমস্যা এবং বাজার অর্থনীতির লাগামহীন আক্রমণে পরিবেশ ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের যে ক্ষতি হচ্ছে সেসব প্রসঙ্গ বেশ জোরালোভাবেই এনেছেন। আশা করছি অদূর ভবিষ্যতে তিনি তার হালের এই ভাবনাসমূহ কোথাও লিখে ফেলবেন এবং পরবর্তীতে 'উন্নয়ন জিজ্ঞাসা'র নতুন সংস্করণে যুক্ত করবেন।

তৃতীয়ত ঃ আনিসুর রহমান যে সব বিষয় তার উন্নয়ন ভাবনায় এনেছেন সেসবের একটি দৃঢ় ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায় রবীন্দ্র রচনাবলীতে। রবীন্দ্র রচনাবলীর দ্বিতীয় খন্ডের 'আত্মশক্তি' পর্বে এমন সব ভাবনার বিস্তার ঘটিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, যেগুলো আজ থেকে প্রায় পঁচাত্তর বছর আগে লেখা। আত্মসম্মান নিয়ে বাঁচার তাগিদ তার ঐসব লেখায় খুবই জোরালো। একইভাবে রবীন্দ্র রচনাবলীর বিভিন্ন খন্ডে শিক্ষা বিষয়ে প্রচুর ভাবনার ছাপ রেখেছেন। তাছাড়া চতুদর্শ খন্ডে 'সমবায় নীতি' পর্বে আমাদের মতো দেশের অর্থনীতির শেকড় কোথায় তা স্পষ্ট করেই ধরতে পেরেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এই পর্বের ভূমিকায় লিখেছিলেন "মাতৃভূমির যথার্থ স্বরূপ গ্রামের মধ্যেই; এই খানেই প্রাণের নিকেতন; লক্ষ্মী এই খানেই তাহার আসন সন্ধান করেন।"

"সমবায়-১" নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন "আমাদের দেশে টাকার অভাব আছে, একথা বলিলে সবটা বলা হয় না। আসল কথা, আমাদের দেশে ভরসার অভাব" (পৃঃ৩১৩)। এই ভরসার কথাই আনিসুর রহমান বার বার তার "উন্নয়ন জিজ্ঞাসা"তে উত্থাপন করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ভিন্নভাবে যেকথা বলেছেন, আনিসুর রহমান তাই স্পষ্ট করে তুলেছেন। ব্যক্তির লোভ আর সমাজের নিয়ন্ত্রণ, ব্যক্তির প্রচেষ্টা আর যৌথ ব্যবস্থাপনা – এই মৌল বিষয়টি উভয়েই তাদের মতো করে আনার চেষ্টা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন "জনসাধারণের যদি নিজের অর্জনশক্তিকে একত্র মেলাবার উদ্যোগ করে তবে এই কথা স্পষ্ট দেখিয়ে দিতে পারে যে, যে মূলধনের মূল সকলের মধ্যে তার মূল্য ব্যক্তিবিশেষের মূলধণের চেয়ে অসীম গুণে বেশি" (পৃঃ ৩১৮)। মানুষের মনে ধনভোগের ইচ্ছে আছে। সে ইচ্ছেকে কৃত্রিমভাবে, জোর করে নিরস্ত করে চান না রবীন্দ্রনাথ। তিনি বরং বলেন ''সেই ইচ্ছাকে বিরাটভাবে সার্থক করার দ্বারাই তাকে তার সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করা যেতে পারে (পৃঃঐ)"। আরো বহুবার ধনকে সকলের

মধ্যে মুক্তি দেবার কথা বলেছেন। আমাদের গ্রামবাংলার ঐতিহ্য, সাংস্কৃতিক সহ–অবস্থান, আত্মীয়স্বজনের সহমর্মিতা ইত্যাদি চেতনাকে সমবায় চেতনায় প্রবাহিত করে রবীন্দ্রনাথ যে টেকসই অর্থনীতি ও সমাজের স্বপ্ন দেখেছেন, সেটিই ভিন্নভাবে আনিসুর রহমানের যৌথ উদ্যোগের, সৃজনশীলতার ভাবনায় স্বউদ্যোগে উন্নয়ন ভাবনায় এসে যায়। আনিসুর রহমানের মতো রবীন্দ্রপ্রেমিকই পারেন তার নিজস্ব সৃজনশীল উন্নয়ন ভাবনাকে রবীন্দ্রনাথের আর্থ-সামাজিক ভাবনার ভিত্তির ওপর সুদৃঢ়ভাবে প্রোথিত করতে। এর ফলে আমরা একরৈখিক উন্নয়ন ভাবনার এই যুগে অন্তত একটা বিকল্প উন্নয়ন প্যারাডাইমের ঐতিহ্যিক ভিত্তিভূমির সন্ধান পেয়ে যেতে পারি। আনিসুর রহমান, অমর্ত্য সেনের মতো বাঙালি পন্ডিতরা যদি প্রচলিত উন্নয়ন দর্শনকে বাজিয়ে দেখার সময় রবীন্দ্র ভাবনাকে মাথার পেছনে রাখেন আমার দৃঢ়বিশ্বাস উন্নয়ন ভাবনায় নতুন মাত্রা যুক্ত হবে। অধ্যাপক আনিসুর রহমান ইতিমধ্যেই উন্নয়ন ভাবনার পরিমন্ডলে যে ভরসার সুবাতাস বইয়ে আনতে পেরেছেন, আমারা আশা করছি আগামী দিনে তা আরো বেগমান হবে। রবীন্দ্রভাবনা থেকে অনুপ্রেরণা পেলে তিনি যে উন্নয়ন ভাবনায় নতুন মাত্রার সংযোজন ঘটাতে পারবেন সে বিশ্বাস আমার আছে। ’উন্নয়ন জিজ্ঞাসা’ সেই ভরসাই দেয়। আনিসুর রহমানের ‘উন্নয়ন জিজ্ঞাসা” বাংলায় ছেপে ব্র্যাক প্রকাশনী প্রশংসনীয় উদ্যোগ নিয়েছে। লেখক ও প্রকাশক উভয়ের কাছেই আমরা কৃতজ্ঞ।

............**............

দৈনিক সংবাদ ২২ জুলাই ১৯৯৩